প্রথম আলো

কলাম

মতামত

প্রাথমিকে ভালো শিক্ষকদের ধরে রাখা যাচ্ছে না কেন

লেখা: রঞ্জু খন্দকার

প্রকাশ: ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮: ৩৭

গ্রামে একটা গল্প আছে। গল্পটা বেশ নারীবিরোধী, কিন্তু প্রচলিত। গল্পটা এমন—এক ব্যক্তি স্ত্রীকে ভাত-কাপড় যা-ই দেন, ঠিকঠাকই দেন। কিন্তু পান থেকে চুন খসলেই নিষ্ঠুরের মতো পেটান। তো লোকজন বলে, যাকে নিয়ে সংসার করবি, তাকে এত পেটাস কেন? স্ত্রী নির্যাতনকারী স্বামীর নির্বিকার জবাব, ‘সংসার করব কী করব না, এত পেটানোতেও বোঝা যাচ্ছে না?’

অনেকের ধারণা, বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে সরকারের অবস্থান অনেকটা সেই স্ত্রী নির্যাতক স্বামীর মতো। মুখে কিছু বলে না। কিন্তু মেধাবীদের রাখতে চায় কি না, তা কাজে বোঝা যায় না?

এবার গল্প নয়, আমার স্কুলের সত্যিকার চিত্র তুলে ধরি। পাঁচ পদের পুরোনো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আমার। এর মধ্যে একজন ছয় মাস ধরে মাতৃত্বকালীন ছুটিতে। আরেকজন দশ মাসের বনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে।

এক শিফটে পরিচালিত ১৭০ শিক্ষার্থীর স্কুলটি এ বছরের শুরু থেকেই চলছে এমন ধুঁকেধুঁকে। তার ওপর সহকারী উপজেলা বা থানা শিক্ষা কর্মকর্তা (এটিইও) নিয়োগ পরীক্ষার ঠিক দুদিন আগে আমার স্কুলের আরেকজন শিক্ষক পদত্যাগ করে চলে গেছেন একটি বেসরকারি চাকরিতে। ফলে স্কুলে এখন শিক্ষক আছেন দুজন।

শুধু এ বছরেই নয়, আমার প্রায় পাঁচ বছরের শিক্ষকজীবনের বেশির ভাগ সময়ই যাচ্ছে এমন চরম শিক্ষক-সংকটে। সম্ভবত কোনো বছরেই স্কুলে সব শিক্ষককে কর্মরত অবস্থায় পাইনি।

ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে প্রেষণে শিক্ষক চেয়ে ধরনা দিয়েও ফলাফল? বিরাট অশ্বডিম্ব।

কারণ? স্থানীয় কর্মকর্তাদেরও অনেক ক্ষেত্রেই হাত-পা বাঁধা। অনেক দিন ধরেই প্রেষণে শিক্ষকদের পদায়ন বন্ধ। আর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তো ঢাকায়।

মাঠের এত সংকট শোনার সুযোগ কোথায় তাদের? যেখানে শিক্ষা খাতে বাজেট বসেছে এবার উলটো রথে!

এখন এই চরম চিত্র কি শুধু আমার স্কুলে? আমার পর্যবেক্ষণ বলছে, না। সাদা চোখে (যদিও আমি চশমা পরি, তবে সেটাও স্বচ্ছ) যতটুকু দেখি, আমার পুরো পলাশবাড়ী উপজেলা এমনকি গাইবান্ধা জেলার চিত্রই এমন।

হয়তো পুরো দেশের সঙ্গেও তা মিলে যেতে পারে। অল্প কিছু ভাগ্যবান বিদ্যালয় ছাড়া বেশির ভাগই চলছে খুঁড়িয়ে।

তো সেই খোঁড়ানোর চিত্রটি কেমন? তা উঠে এসেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরেরই করা বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারিতে (এপিএসসি)।

এপিএসসির তথ্য মতে, দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৬৫ হাজার ৫৬৭টি। এসব বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের অনুমোদিত পদ ৬৫ হাজার ৪৫৭টি।

এর মধ্যে ৩৪ হাজার ১০৬টি পদ শূন্য। সহকারী শিক্ষকের অনুমোদিত পদ ৩ লাখ ৫৫ হাজার ৬৫৩টি। এর মধ্যে ২৪ হাজার ৫৩৬টি পদ শূন্য। এসব বিদ্যালয়ে পড়ে এক কোটির মতো শিক্ষার্থী।

হিসাব করে দেখা যাচ্ছে, দেশে শিক্ষকের মোট শূন্য পদ ৫৮ হাজার ৬৪২টি। এর মধ্যে বছরজুড়ে কতজন প্রশিক্ষণে থাকেন কিংবা কতজন দীর্ঘমেয়াদি ছুটিতে থাকেন, তা উল্লেখ নেই। কিন্তু যেভাবেই হোক, সংকটটা পড়ে স্কুলেই।

অভিজ্ঞতা বলছে, সরকারি প্রাথমিকের এই বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর বেশির ভাগের অভিভাবকেরই শিশুকে নিজে পড়ানোর বা বাইরের শিক্ষক দিয়ে পড়ানোর অবস্থা নেই। ফলে জাতির মেরুদণ্ড গড়ার অত্যন্ত স্পর্শকাতর এই দায়িত্বটি প্রাথমিকের শিক্ষকদের ওপরেই ন্যস্ত।

তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম, কিছু শিক্ষক কর্তব্যকর্মে অবহেলা করেন। কিন্তু যাঁরা দায়িত্বটুকু সুচারুভাবে পালন করতে চান, তাঁদের সেই সুযোগ কতটুকু?

আমার স্কুলেই এত দিন তিনজন শিক্ষক ছিলেন, তার মধ্যে একজন চলে যাওয়ায় এখন দুজন শিক্ষকের পক্ষে দিনে কতটি করে ‘মানসম্পন্ন’ ক্লাস নেওয়া সম্ভব? সেই সকাল ৯টায় শুরু করে মাঝে আধা ঘণ্টার টিফিন বিরতি ছাড়া টানা বিকেল সোয়া চারটা পর্যন্ত কত কর্মঘণ্টা কথা বলা সম্ভব?

এটা তো আর যা-ই হোক, মাঠে মাটিকাটা বা টেবিলে বসে টালি তৈরি করার কাজ নয়। ফলে আমার বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মতো যাঁরা টানা ক্লাস নেন, একজন প্রধান শিক্ষক হিসেবে তাঁদের দেখলে সত্যি মায়া হয়, শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে।

আর প্রধান শিক্ষকদের পাঠদানের পাশাপাশি নানা কাগজপত্রের মুসাবিদা করা তো আরেক মুসিবতের নামান্তর।

তো এই যখন অবস্থা, তখন মেধাবী শিক্ষক যাঁরা নানা কারণে প্রাথমিকে চলে আসেন, তাঁদের ধরে রাখার উপায় কী? একে তো কর্মঘণ্টার কঠিন যাতনা, তার ওপর বেতন-গ্রেড, পদ-পদবি-প্রমোশনে লবডঙ্কা!

সরকারি অন্যান্য বিভাগে দেখা যাচ্ছে, মুদ্রাক্ষরিক থেকে শুরু করে গাড়িচালকেরা পর্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা হিসেবে তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছেন, শুধু প্রাথমিকের বেলায় রাজভান্ডার নাকি শূন্য হয়ে পড়ে।

শেষ করার আগে আমার স্কুলের সদ্যবিদায়ী সেই শিক্ষকের কথা তুলে ধরতে চাই। ওই শিক্ষক পড়াশোনা করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। নিজ গ্রামের স্কুলে যোগদান করেছিল অনেক স্বপ্ন নিয়ে। গ্রামের শিশুদের শিক্ষিত করবে, নিজেও কিছু একটা করে খাবে।

কিন্তু স্কুলে একটার পর একটা ক্লাসের যে চাপ, এর বিনিময়ে ৬ টাকা টিফিন ভাতাসহ মাসিক যে সম্মানী; তাতে সম্মানসহ এলাকায় টিকে থাকাই তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এখন শিক্ষকদের এতসব বঞ্চনা নিয়ে রিট, পালটা রিট, মাঠে আন্দোলন, মামলা, কলম বা কিবোর্ডক্ষয়ী লেখালেখি তো কম হলো না। ফলাফল? মামলায় শুনানির পর শুনানির গ্যাঁড়াকল, কিবোর্ডকে রুখে দেওয়ার কলমের খোঁচা, মিছিলে গরম পানি, প্যাঁদানি।

শেষমেশ গ্রামের সেই স্ত্রী নির্যাতক স্বামীর মতোই বলতে হয়, এত পেটানোর পরও বোঝা কি যাচ্ছে না, সরকার মেধাবীদের নিয়ে ‘সংসার করতে’ চায় কি চায় না?

এখন প্রাথমিকে টিকে থাকার জন্য সামনে তাঁর জন্য খোলা ছিল এটিইও পদে নিয়োগের বিভাগীয় পরীক্ষা। কিন্তু সেই পরীক্ষাতেও নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভাগীয় অভিজ্ঞতার কোনো মূল্যই রাখা হয়নি।

যে নবীন শিক্ষকের চাকরিই স্থায়ী হয়নি, এমনকি প্রাথমিকের মৌলিক প্রশিক্ষণই যিনি নেননি, তাঁরাও আবেদন করতে পেরেছেন একই বিভাগের কর্মকর্তা পদে! অথচ সরকার প্রায়শই আলাদা বিজ্ঞপ্তি দিয়েও এটিইও পদে নবীনদের নিয়োগ দিয়ে থাকে।

তাহলে বিভাগীয় পরীক্ষার নামে এই মুলা ঝোলানোর মানে কী? ফলে সামনে সম্ভাব্য এটিইও হওয়ার প্রলোভনেও ওই শিক্ষক আর পা দিতে রাজি হলেন না। সসম্মানে পত্রপাঠ বিদায় নিয়েছেন।

এখন শিক্ষকদের এতসব বঞ্চনা নিয়ে রিট, পালটা রিট, মাঠে আন্দোলন, মামলা, কলম বা কিবোর্ডক্ষয়ী লেখালেখি তো কম হলো না।

ফলাফল? মামলায় শুনানির পর শুনানির গ্যাঁড়াকল, কিবোর্ডকে রুখে দেওয়ার কলমের খোঁচা, মিছিলে গরম পানি, প্যাঁদানি।

শেষমেশ গ্রামের সেই স্ত্রী নির্যাতক স্বামীর মতোই বলতে হয়, এত পেটানোর পরও বোঝা কি যাচ্ছে না, সরকার মেধাবীদের নিয়ে ‘সংসার করতে’ চায় কি চায় না?

- **রঞ্জু খন্দকার**: লেখক ও শিক্ষক।
  alamgircj@gmail.com

(মতামত লেখকের নিজস্ব)

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান

স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৫ প্রথম আলো